অধ্যায়-১ : আধুনিক বাংলা কবিতা-১

বিন্যাসক্রম

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১.২ পরিচিতি
১.৩ বঙ্গভূমির প্রতি–মাইকেল মধুসূদন দত্ত
১.৩.১ কবি-পরিচয়
১.৩.২ সারসংক্ষেপ
১.৩.৩ কবিতার বিশ্লেষণ
১.৩.৪ শব্দার্থ
১.৪ কৃপণ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১.৪.১ কবি-পরিচয়
১.৪.২ সারসংক্ষেপ
১.৪.৩ কবিতার বিশ্লেষণ
১.৪.৪ শব্দার্থ
১.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ
১.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১.৭ অতিরিক্ত পঠন
১.৮ অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্নের উত্তর সংকেত
১.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি-

- মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভূমির প্রতি' শীর্ষক কবিতার কাহিনি ভাগের সঙ্গে পরিচিত হবেন। কবিতাটি সংবেদনশীল পাঠকের মনে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তুলতে অব্যর্থ।
- রবীন্দ্রনাথের 'কৃপণ' কবিতায় ধরা আছে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচেতনার স্বরূপ; সমর্পণের তাৎপর্য।
- প্রতিটি কবিতার আলোচনা বা বিশ্লেষণ অবলম্বন করে অধ্যায়ের শেষে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে তার উত্তর লিখতে পারবেন এবং কবিতার নির্বাচিত অংশের ব্যাখ্যাও করতে পারবেন।

১.২ পরিচিতি

বর্তমান অধ্যায়ে আপনারা যে-দু'টি কবিতা পড়বেন- বিষয়গত ও ভাষাগত দিক দিয়ে দু'টি রচনা'ই আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। সেইসূত্রে বাংলা সাহিত্যের দুই অতিব শক্তিশালী কবির পরিচয়

সম্পর্কেও আপনাদের জানার সুযোগ হবে। নির্দিষ্ট কবিতার সারসংক্ষেপ জানবেন এবং কবিতার বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ পড়বেন।

১.৩ বঙ্গভূমির প্রতি – মাইকেল মধুসূদন দত্ত

- **মূল পাঠ**

রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন;
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে

মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!

১.৩.১ কবি-পরিচয়

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি, অধুনা বাংলাদেশের যশোহরে, সাগরদাঁড়ি গ্রামে। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী। মা- জাহ্নবী দেবী। ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি হওয়ার স্বপ্ন সফল করতে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে মধুসূদন ধর্মান্তরিত হন। সেই সূত্রেই তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয় 'মাইকেল' শব্দটি। ইংরেজি ভাষায় 'The Captive Ladie' এর মতো একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি; কিন্তু চূড়ান্ত কবি-প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' ইত্যাদির মাধ্যমে। উল্লেখ্য, বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক তিনি; সেই সঙ্গে তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে ইংরেজি 'Blank Verse' ছন্দকে রূপায়ণ করেন অমিত্রাক্ষর ছন্দরূপে। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জীবনদীপ নিভে যায়।

১.৩.২ সারসংক্ষেপ

'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবাস যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর জন্মভূমি বঙ্গভূমির কাছে এই প্রার্থনা করেছেন যে, বঙ্গমাতা যেন তাঁর 'দাস' ছেলেকে কখনও না ভোলেন। কবি তাঁর বহুদিনের মনের সাধ পূরণের জন্য ইউরোপে পাড়ি দিচ্ছেন; সেখানে গিয়ে নানা ভুলভ্রান্তি হতে পারে। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর খেয়ালে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাতেও কবি সন্ত্রস্ত নন। তাঁর একটাই কামনা, বঙ্গমাতার করুণায় সিক্ত হৃদয়ে অম্লান হয়ে থাকা। কিন্তু এই পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার জন্য যে বিশেষ গুণের প্রয়োজন, তা কি তাঁর আছে! কুণ্ঠিত কবি তাই বঙ্গমাতাকে জন্মদাত্রী মায়ের সঙ্গে সমন্বিত করে কাতর অনুনয় করেন- মা তো সন্তানকে ফেরাতে পারেন না; শস্যশালিনী বঙ্গভূমি অর্থাৎ স্বদেশমাতৃকাও যেন তাঁর দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে শুভ বর দান করেন যাতে কবি চিরকাল বঙ্গভূমির জনমানসে ভাস্বর হয়ে থাকেন।

১.৩.৩ কবিতার আলোচনা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভূমির প্রতি' একটি কালজয়ী সৃষ্টি। 'মধুসূদন রচনাবলী'র 'নানা কবিতা' বিভাগের অন্তর্গত দ্বিতীয় গীতিকবিতা এটি। বিখ্যাত ইংরেজ কবি জর্জ কর্ডন বায়রন বা লর্ড বায়রনের একটি কবিতা তথা গানের লাইন "My native Land, Good Night!" দিয়ে কবিতাটির শুরু হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অল্প বয়স থেকেই শেলী, কীটস, বায়রন প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত কবিদের কবিতা পাঠে মুগ্ধ-বিস্ময়ে নিমগ্ন হয়েছিলেন কবি আর এখানে 'Good Night' কথাটি আক্ষরিক অনুবাদ রূপে শুভরাত্রি হিসেবে গ্রহণ করলে চলবে না। কবি মধুসূদন এখানে জন্মভূমিকে বিদায় জানাতে 'বিদায়' অর্থে বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য, মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ইউরোপ প্রবাসের পূর্বে ৪ঠা জুন, ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা (অষ্টচত্বারিংশ) পত্রের শেষে প্রসঙ্গক্রমে আলোচ্য 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি গ্রন্থিত করেন।

'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটিতে দেখা যায়, প্রবাস যাত্রার প্রাক্কালে জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধাশীল কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গভূমিকে 'মা' বলে সম্বোধন করে নিজেকে ক্ষুদ্র তুচ্ছরূপে উপস্থাপন করতে 'দাস' বলে চিহ্নিত করে বঙ্গমাতা তথা স্বদেশ মাতৃকার কাছে প্রার্থনা করছেন যে, বঙ্গমাতা যেন কবিকে বিস্মৃত না হন, তিনি যেন তাঁর পদপ্রান্তের কৃপা করুণা থেকে কবিকে কখনও বঞ্চিত না করেন। মনের সাধ পূরণ করার জন্য মধুকবি ইউরোপে পাড়ি দিচ্ছেন মাতৃভূমি ছেড়ে; সেখানে গিয়ে যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি ঘটে- তখনও যেন বঙ্গমাতা তাঁকে দূরে ঠেলে না দেন। কবি লিখেছেন: 'মধুহীন কর না গো তব মনঃ কোকনদে'। মধুশূন্য কোকনদ অর্থাৎ লালপদ্ম যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনই কবি মধুসূদন মনে করেন মাতৃভূমির স্নেহ-মমতা বিহনে তিনিও নিঃস্ব, রিক্ত, অস্তিত্বহীন। লক্ষণীয়, 'মধু' বলতে মধুকবি নিজেকে ইঙ্গিত করে বঙ্গমাতার করুণাসিক্ত হৃদয়কে স্নিগ্ধ পদ্মের সাথে তুলনা করে কাতর প্রার্থনা করেছেন বঙ্গমাতা যেন তাঁকে মন থেকে মুছে না ফেলেন।

জন্ম-মৃত্যু মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। তাই কবিতাটিতে দেখা যায়, কবি বলতে চান, প্রবাসে অর্থাৎ বিদেশে গিয়ে বিধির বিধান অনুযায়ী যদি কবির মৃত্যু হয়, যদি দেহরূপ আকাশ থেকে প্রাণের প্রতীক জীবতারা (আত্মা) খসে পড়ে, তাতে কবির কোন আক্ষেপ বা অনুতাপ থাকবে না। কারণ বাস্তববাদী কবি জানেন জন্ম গ্রহণ করলে একদিন না একদিন মৃত্যু বরণ করতেই হবে। এই পৃথিবীতে কেউ অমর বা মৃত্যুহীন নয়। জীবনের ধর্ম যেমন চলমানতা, তেমনই নদীর ধর্মও বহমানতা। তাই জীবনরূপ নদীতে নীর অর্থাৎ জলরাশি কখনও স্থির হয়ে থাকে না। সে উৎস থেকে বয়ে চলে মোহনার দিকে অবিরত।

কবি মৃত্যুভয়ে ভীত নন। তিনি বঙ্গভূমি বঙ্গমাতা অন্তপ্রাণ। তাই আলোচ্য কবিতায় পুনরায় স্বদেশমাতার উদ্দেশে কবিকে বলতে শোনা যায়, তিনি যদি মধুকবিকে তাঁর হৃদয়ে জাগরূক রাখেন, তাহলে শমন অর্থাৎ মৃত্যুর দেবতা যমের ভয়ও তাঁর কাছে তুচ্ছ।

পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী সমুদ্র মন্থনের সময় অমৃত ও হলাহল উত্থিত হয়েছিল। সেই অমৃত পান করলে অমরত্ব লাভ করা যায়। কৌশলে সেই অনুষঙ্গ নিয়ে এসেছেন মধুকবি আলোচ্য কবিতায়। কবি বলতে চান: "মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!" মক্ষিকা অর্থাৎ ক্ষুদ্র মাছির সঙ্গে যেন মধুকবি নিজেকে তুলনা করতে চান। আর বঙ্গমাতার হৃদয় তাঁর কাছে 'অমৃত-হ্রদ' স্বরূপ। কবি আশাবাদী, সেখানে ঠাঁই পেলে কালে কালান্তরে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

কবি বিশ্বাস করেন মানববিশ্বে সেই জীবনই সার্থক- সার্বিক অনুপস্থিতিতেও মানুষ যাকে ভোলে না। সৎ কর্ম তথা বিবিধ শুভ গুণের জন্য পার্থিব জগৎ ছেড়ে চলে যাবার পরও যিনি মানুষের হৃদয়-মন্দিরে শ্রদ্ধার আসনে উপবিষ্ট থাকেন। সেই সূত্র ধরেই কবিতার শেষ অংশে কবি বলতে চান, তিনি গুণহীন। তাঁর এমন কোন বিশেষ গুণ নেই যার জন্য তিনি 'শ্যামা জন্মদে' অর্থাৎ শস্যশালিনী জন্মদাত্রী বঙ্গমাতার কাছে অমরত্ব চাইতে পারেন।

কবি বঙ্গমাতাকে জন্মদাত্রীর সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। মা মানেই তো কৃপা করুণার আধার। তাই গুণহীন জেনেও শেষ পর্যন্ত কবির নিবেদন: "তবে যদি দয়া কর,/ ভুল দোষ, গুণ ধর,/ অমর করিয়া বর/ দেহ

দাসে, সুবরদে!-" 'সুবরদে' অর্থাৎ যিনি 'সু' (শুভ/কল্যাণ) বর প্রদান করেন বঙ্গমাতাকে কল্যাণময়ী বরদাত্রী সম্বোধন করে কবির প্রার্থনা, মানস সরোবরে যেমন বসন্ত হোক কিংবা শরৎ- যে-কোনও ঋতুতে তামরস অর্থাৎ মধুময় পদ্মফুল ফুটে থাকে, বঙ্গমাতা যদি দয়া করে কবির ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে শুধু গুণটুকুকে বিবেচনা করে কবির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন- তবে তিনিও বঙ্গভূমির প্রতিটা মানুষের স্মৃতিতে অর্থাৎ মনে-মননে চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবেন।

১.৩.৪ শব্দার্থ

গীতিকবিতা- এখানে কবি হৃদয়ের একান্ত আবেগ-অনুভূতি-কল্পনা ছন্দময় ভাবে প্রকাশিত হয়।

দাস- অধীন বা অনুগত ব্যক্তি।

মিনতি- অনুনয়, বিনীত অনুরোধ।

পরমাদ- 'প্রমাদ'-এর পরিবর্তিত রূপ, যার অর্থ ভুলভ্রান্তি।

কোকনদ- লাল পদ্ম।

প্রবাস- বিদেশ।

দৈব- অদৃষ্ট, ভাগ্য।

নীর- জল।

শমন- মৃত্যুর দেবতা যমরাজ।

মক্ষিকা- মাছি।

অমৃত- সুধা, যা পান করলে মানুষ মৃত্যুহীন হয়।

অমৃত হ্রদ- সুধায় পূর্ণ হ্রদ।

জন্মদে- জন্ম দেন যিনি, জননী।

সুবরদে- সু অর্থাৎ শুভ বর দেন যিনি, বরদাত্রী।

মধুময়- মধুতে ভরা।

তামরস- পদ্ম।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রস্তুত করুন। (১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে)

২। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় লিখুন। (১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে)

১.৪ কৃপণ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম
গ্রামের পথে পথে, তুমি তখন চলেছিলে

তোমার স্বর্ণরথে।
অপূর্ব এক স্বপ্ন-সম
লাগতেছিল চক্ষে মম--
কী বিচিত্র শোভা তোমার,
কী বিচিত্র সাজ।
আমি মনে ভাবেতেছিলেম,
এ কোন্ মহারাজ।
আজি শুভক্ষণে রাত পোহালো
ভেবেছিলেম তবে,
আজ আমারে দ্বারে দ্বারে
ফিরতে নাহি হবে।
বাহির হতে নাহি হতে
কাহার দেখা পেলেম পথে,
চলিতে রথ ধনধান্য
ছড়াবে দুই ধারে-
মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব,
নেব ভারে ভারে।
দেখি সহসা রথ থেমে গেল
আমার কাছে এসে,
আমার মুখপানে চেয়ে
নামলে তুমি হেসে।
দেখে মুখের প্রসন্নতা
জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা,
হেনকালে কিসের লাগি
তুমি অকস্মাৎ
"আমায় কিছু দাও গো" বলে
বাড়িয়ে দিলে হাত।
মরি, এ কী কথা রাজাধিরাজ,
"আমায় দাও গো কিছু!"
শুনে ক্ষণকালের তরে

রইনু মাথা-নিচু।
তোমার কী-বা অভাব আছে
ভিখারী ভিক্ষুকের কাছে।
এ কেবল কৌতুকের বশে
আমায় প্রবঞ্চনা।
ঝুলি হতে দিলেম তুলে
একটি ছোটো কণা।
যবে পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি-এ কী!
ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো
সোনার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজ-ভিখারীরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে-
তোমায় কেন দিই নি আমার
সকল শূন্য করে।

১.৪.১ কবি-পরিচয়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ সালের ৭ই মে, কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে। পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদা দেবী। শিশুকাল থেকেই তাঁর সৃজন প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। সাহিত্যের এমন কোন পর্যায় নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের লেখনি পৌঁছয়নি। কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি সাহিত্যের প্রতিটি শাখাকেই তিনি সমৃদ্ধ করেছেন আপন সৃজন দক্ষতায়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'গীতাঞ্জলি' ('Song Offerings') কাব্যের জন্য লাভ করেছেন নোবেল পুরস্কার। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত রচনাবলির মধ্যে রয়েছে 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'পূরবী', 'প্রান্তিক' প্রভৃতি কবিতা সংকলন; 'রাজা', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' ইত্যাদি নাটক; 'চোখের বালি', 'ঘরে-বাইরে', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা', 'যোগাযোগ' ইত্যাদি উপন্যাস; রয়েছে 'জীবনস্মৃতি', 'আত্মপরিচয়' ইত্যাদি আত্মজীবনী। উল্লেখ্য, 'গল্পগুচ্ছ' এর চারটি খণ্ডে তাঁর প্রায় আশিটি ছোটগল্প গ্রন্থিত হয়েছে। তাঁর সৃজন বিশ্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতা অসীম। একাধারে তিনি চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতকার, সম্পাদক, সংগঠকও। ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট বিধাতার আশীর্বাদধন্য এই অভূতপূর্ব কর্মপুরুষ অমৃতলোকে পাড়ি দেন।

১.৪.২ সারসংক্ষেপ

'কৃপণ' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ একটি রূপকের আড়ালে মূল বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। কবিতাটিতে দু'টি বিশেষ চরিত্রকে হাজির করেছেন কবি। ভিখারি এবং রাজভিখারি। এখানে রাজভিখারি স্বয়ং ঈশ্বর; তিনি রাজার রূপ ধরে পরীক্ষা নিতে এসেছেন। তাই দীন ভিখারির সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হলে ছলনা করে অসহায় ভিখারির কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়েছেন। বুঝতে চেয়েছেন ভিখারির মানস অবস্থান। নিজেকে উজাড় করে সবটা বিলিয়ে দিতে পারলেন না ভিখারি। মানসিক কার্পণ্য তার পূর্ণতার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তিনি কৃপণ। সঞ্চয়ের সাধ তাকে পিছু টেনেছে। দরিদ্রতা তাই ঘুচল না। কারণ সমর্পণ অর্থাৎ নিজেকে শূন্য করে বিলিয়ে না দিলে ঈশ্বর অনুগ্রহ লাভ করা যায় না।

১.৪.৩ কবিতার বিশ্লেষণ

'কৃপণ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্র কবিতাটি লেখা হয়। আলোচ্য কবিতায় কবির ঈশ্বর চেতনার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। ঈশ্বর ঐশ্বর্যবান, তিনি ভক্তের অধীন। নিজেকে শূন্য করে তাঁর কাছে সমর্পণ করলে তাঁর দাক্ষিণ্য লাভ করা যায়।

'কৃপণ' কবিতাটিতে দু'টি বিশেষ চরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন রবি ঠাকুর। আলোচ্য কবিতায় ভিখারি হচ্ছেন মর্ত্যধুলার ক্ষুদ্রমনা এক সাধারণ মানুষ; আর রাজভিখারি হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি রাজরূপ ধরে পরীক্ষা নিতে এসেছিলেন পথের ভিখারির। কবিতাটিতে দেখা যায়, একদিন ভিক্ষা করার অভিপ্রায়ে ভিখারি লোকটি যখন গ্রামের পথে বেরোন, তখন দেখতে পান সোনার রথে চড়ে একজন মহারাজ ক্রমশ এগিয়ে আসছেন। রাজার ঐশ্বর্য খচিত রথ এবং অনন্য রাজবেশ দেখে ভিখারি চমকিত হন। তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয় সবকিছু। তাই তার উচ্চারণ: "অপূর্ব এক স্বপ্নসম লাগতেছিল চক্ষে মম- / কী বিচিত্র শোভা তোমার, কী বিচিত্র সাজ। / আমি মনে ভাবতেছিলেম এ কোন মহারাজ।।" এমন সোনায় মোড়া রথ কিংবা দিব্যকান্তি রাজপুরুষ তিনি কোনো দিন দেখেননি আগে।

দীন ভিখারি লোকটির মনে আশা জাগে। কারণ রাজারা মুক্তহস্ত, দয়ালু প্রকৃতির হন। সুতরাং এই রাজাও যখন গ্রামের পথ দিয়ে যাবেন তখন নিশ্চয়ই পথের দুই ধারে ধনধান্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবেন। আর তিনি মুঠো ভরে সব কুড়িয়ে নেবেন। তার দরিদ্রতা মোচন হবে। তাকে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ফিরে ভিক্ষা মাগতে হবে না। আর এই আনন্দে আত্মহারা দীন ভিখারি ভাবেন 'আজি শুভক্ষণে রাত পোহালো...।'

দীন ভিখারি উচ্ছ্বসিত। হঠাৎ তার সামনে এসেই রাজরথ থামল। এ তো অপ্রত্যাশিত। ভিখারি লক্ষ করলেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে নেমে আসছেন রাজা। তাঁর প্রসন্ন বদন দেখে ভিখারি লোকটির এতদিনের অসহায়তার যন্ত্রণা যেন জুড়িয়ে গেল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই দীন ভিখারির সমস্ত

আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। কারণ, একজন চূড়ান্ত বৈভবশালী রাজা যে একজন দরিদ্র ভিখারির কাছে 'আমায় কিছু দাও গো' বলে হাত পেতে দাঁড়াতে পারেন, সেটা তার কল্পনার অতীত ছিল। রাজারূপী ঈশ্বরের পরীক্ষা বোঝার সাধ্য কারও নেই। তিনিও বুঝতে পারেননি।

ভিখারি লোকটি রাজাধিরাজের এমন আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন, লজ্জিত হলেন, মাথা নিচু করে রইলেন খানিকক্ষণ। এরপর নিজেকে সামলাতে না পেরে আশ্চর্য কণ্ঠে প্রশ্ন করেন: "মরি, এ কী কথা রাজাধিরাজ, 'আমায় দাও গো কিছু-" কারণ একজন রাজার কী এমন অভাব থাকতে পারে যে তাঁকে পথের ভিখারির কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে হয়! তাঁর রাজবেশ, রাজরথের বাহার যেখানে মুগ্ধ বিস্মিত করেছে ভিক্ষুককে, সেখানে রাজার এমন আচরণ তার চূড়ান্ত অস্বস্তির উদ্রেক করে। তিনি ভাবেন, রাজা সম্ভবত তার দারিদ্রতাকে উপহাস বা বিদ্রূপ করার জন্যই এমন অনুরোধ করেছেন। অসহায় ভিখারি দুঃখ পেলেন। কিন্তু রাজ-অনুরোধ ফেলেন কি করে! তাই বিষণ্ন মনে ভিক্ষার ঝুলি থেকে একটি ছোট কণা তুলে দিয়ে গ্রামের পথে ভিক্ষার উদ্দেশে বেরিয়ে যান।

ভিক্ষা শেষে ক্লান্ত ভিক্ষুক ঘরে ফিরে আসেন। তারপর ভিক্ষা পাত্রটি উপুড় করে যখন সংগৃহিত ভিক্ষার দিকে চোখ রাখেন, তখন স্তব্ধ হয়ে যান। তিনি লক্ষ করেন ভিক্ষা পাত্রে একটি ছোট সোনার কণা। ভিক্ষুক বুঝতে পারেন তিনি যে একটি ছোট কণা রাজাধিরাজকে দান করেছিলেন, সেটিই সোনায় রূপান্তরিত হয়ে তার কাছে ফিরে এসেছে। রাজাধিরাজ ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি যে সামান্য মর্ত্য মানুষ নন, স্বয়ং ঈশ্বর এবং সেই সঙ্গে তিনি কেন এসেছিলেন কিংবা কিসের জন্য হাত পেতে দাঁড়িয়েছিলেন- একে একে সবই উপলব্ধি করতে পারেন দীন ভিখারি। তখনই অনুশোচনা জাগে তার। কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি; অশ্রুসিক্ত নয়নে আত্মধিক্কার জানিয়ে বলতে চান: "তোমায় কেন দিই নি আমার সকল শূন্য করে ?।" ভিখারি যেটুকু দিয়েছেন, সেটুকুই ফিরে পেয়েছেন। মনের কার্পণ্য ত্যাগ করে যদি নিজেকে উজাড় করে দিতেন; যেটুকু ছিল সবটা যদি সমপর্ণ করতে পারতেন তাহলে তাকে সোনায় মুড়িয়ে দিতেন ঈশ্বর। তার দারিদ্রতা চিরকালের জন্য ঘুচে যেত। ভগবান ভক্তের কাছে এই সমপর্ণটুকুই আসলে চান। যে নিজেকে শূন্য করে উদ্বাহু হয়ে তাঁর দুয়ারে দাঁড়ায়, তিনি তার সমস্ত অভাব মোচন করে পরিপূর্ণ করে দেন। রাজাবেশী ঈশ্বরের এই অভিপ্রায় এবং তা চরিতার্থ করার জন্য করা ছলনাকে বুঝতে পারেননি স্বভাব কৃপণ দীন ভিখারি। সঞ্চয়ের সাধে নিজেকে উজাড় করতে পারেননি বলেই তার দারিদ্রতাও ঘুচল না চিরতরে। আসলে পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ এই স্বভাব কৃপণতা থেকে মুক্ত হতে পারে না, দরিদ্র ভিখারিও পারেন নি। ঈশ্বরের পরশ পেয়ে নিজের জীবনকে ধন্য করতে গেলে নিজেকে রিক্ত করে তাঁর পায়ে সমর্পণ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি-ই 'কৃপণ' কবিতাটিতে অনিন্দ্যসুন্দর ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

১.৪.৪ শব্দার্থ

স্বর্ণরথ: সোনা দিয়ে নির্মিত রথ।

শোভা: ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য।

মহারাজ: সম্রাট, বৈভবশালী রাজপুরুষ।

ধনধান্য: টাকাপয়সা।

ভার: বোঝা বহনের জন্য ব্যবহৃত লাঠি।

সহসা: হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত ভাবে।

প্রসন্নতা: সন্তুষ্টি।

অকস্মাৎ: হঠাৎ, সহসা।

রাজাধিরাজ: রাজাদের রাজা।

ক্ষণকাল: অতি সামান্য সময়।

কৌতুক: ঠাট্টা, পরিহাস।

প্রবঞ্চনা: ছলনা, প্রতারণা।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃজন বিশ্বের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থাপন করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

২। 'কৃপণ' কবিতার কাহিনি অংশ নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- যে দুটি কবিতা পড়া হল এর প্রথমটি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রচনা; দ্বিতীয়টি বিশ শতকের প্রারম্ভিক লগ্নের রচনা। বিষয়গত ও ভাষাগত উভয় দিক দিয়ে আলাদা দুটো রচনার সঙ্গে পরিচিতি ঘটল। সেইসঙ্গে দু'জন অনন্য প্রতিভাশালী কবির ব্যক্তি পরিচয়, কবি-মানস, সৃষ্টি প্রতিভা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণায় পৌঁছানা গেল।
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভূমির প্রতি' শীর্ষক কবিতার ছত্রে ছত্রে কবির স্বদেশের প্রতি তীব্র অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে।
- রবীন্দ্রনাথের 'কৃপণ' কবিতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচেতনার স্বরূপ; সমর্পণের তাৎপর্য।

১.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভূমির প্রতি' শীর্ষক কবিতার কাহিনি ভাগের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলাম। কবিতাটি সংবেদনশীল পাঠকের মনে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তুলতে অব্যর্থ হতে পারলাম।

- রবীন্দ্রনাথের 'কৃপণ' কবিতায় ধরা আছে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচেতনার স্বরূপ; সমর্পণের তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পারলাম।
- প্রতিটি কবিতার আলোচনা বা বিশ্লেষণ অবলম্বন করে অধ্যায়ের শেষে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে তার উত্তর লিখতে পারব এবং কবিতার নির্বাচিত অংশের ব্যাখ্যাও করতে পারব।

১.৭ অতিরিক্ত পঠন

গুপ্ত, ড: কে. (জৈষ্ঠ ১৩৬৭). মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প (দ্বিতীয় খণ্ড). কলিকাতা : এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং

বন্দ্যোপাধ্যায়, চ. (১৩৪৬). রবিরশ্মি (দ্বিতীয় খণ্ড). কলিকাতা : এ. কে. মুখার্জ্জী এণ্ড কোং

ভট্টাচার্য, উ. (ভাদ্র ১৩৫৪). রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা. কলিকাতা-১২ : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

মজুমদার, শ্রীম. (কার্ত্তিক ১৩৫৪). কবি শ্রীমধুসূদন (তৃতীয় খণ্ড). কলিকাতা, হাওড়া : বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

১.৮ অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্নের উত্তর-সংকেত

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি, অধুনা বাংলাদেশের যশোহরে, সাগরদাঁড়ি গ্রামে।..... ইংরেজি ভাষায় 'The Captive Ladie' এর মতো একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি; ..... ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জীবনদীপ নিভে যায়। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবাস যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর জন্মভূমি বঙ্গভূমির কাছে এই প্রার্থনা করেছেন যে, ... তাঁর একটাই কামনা, বঙ্গমাতার করুণায় সিক্ত হৃদয়ে অম্লান হয়ে থাকা। .....শস্যশালিনী বঙ্গভূমি অর্থাৎ স্বদেশমাতৃকাও যেন তাঁর দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে শুভ বর দান করেন যাতে কবি চিরকাল বঙ্গভূমির জনমানসে ভাস্বর হয়ে থাকেন। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: সাহিত্যের এমন কোন পর্যায় নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের লেখনী পৌঁছয়নি। ..... রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত রচনাবলির মধ্যে রয়েছে 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য',

'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'পূরবী', 'প্রান্তিক' প্রভৃতি কবিতা সংকলন; ..... তাঁর সৃজন বিশ্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতা অসীম।-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: 'কৃপণ' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ একটি রূপকের আড়ালে মূল বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। ..... বুঝতে চেয়েছেন ভিখারির মানস অবস্থান। ..... কারণ সমর্পণ অর্থাৎ নিজেকে শূন্য করে বিলিয়ে না দিলে ঈশ্বর অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

? ১.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় বঙ্গভূমিকে ভালোবেসে বঙ্গমাতার প্রতি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের যে কাতর প্রার্থনা ব্যক্ত হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করুন।

২। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করে এর নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করুন।

৩। ব্যাখ্যা লিখুন:

ক) "মধুহীন কর না গো তব মনঃ কোকনদে।"

খ) "মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!"

গ) "তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!-"

ঘ) "মরি, এ কী কথা রাজাধিরাজ, 'আমায় দাও গো কিছু'-
শুনে ক্ষণকালের তরে রইনু মাথা-নিচু।"

ঙ) "তোমায় কেন দিই নি আমার সকল শূন্য করে ?।"

৪। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কৃপণ' কবিতাটিতে আসল কৃপণকে-ভিখারি না রাজ-ভিখারি? আপনার মন্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দিন।

৫। 'কৃপণ' কবিতায় ভিখারি ব্যক্তিটি রাজাধিরাজকে ক্ষুদ্র কণা ভিক্ষা দিয়েছিলেন কেন ? পরিশেষে কেনই-বা তার জন্য আক্ষেপ করেছিলেন- আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কৃপণ' কবিতা অবলম্বনে কবির ঈশ্বর চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

*** *** ***